আধুনিকতার দুর্গ দখলের লড়াই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ, রামমোহন ও ডিরোজিও

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনিশ শতকের নগর কলকাতা শুধু বহিরঙ্গে নয় অন্তরঙ্গেও নিজেকে পাল্টে নেবার তাগিদ অনুভব করল। সামাজিক বিন্যাসে যে যে অবস্থানেই থাকুক না কেন তাদের আর আগের চেহারায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। প্রাক্ ইংরেজ পর্বে যারা ফারসি শেখার দৌড়ে মুসলমানদের পিছনে ফেলে দিয়েছিল[১] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজি শেখার দৌড়েও তারা এগিয়ে যাবার তোড়জোড় শুরু করে। উনিশ শতকের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজের সেই সামাজিক ইচ্ছারই ফলবান রূপ ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি স্থাপিত হিন্দু কলেজ।

হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল কলকাতার ভদ্র হিন্দু সন্তানদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য। ইংরেজশাসিত সমাজ পরিস্থিতির দখল যাতে তাদের বংশলোচনদের হাতছাড়া না হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা দফায় দফায় মিটিং -এ বসে কলেজ বিষয়ে যে ৩৬টি বিধির খসড়া তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে ১নং বিধিতে বলা হয়েছিল কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য—

> The Primary object of this institution is tuition of the sons of respectable Hindoos in English and Indian Languages and in the literature and Sicence of Europe and Asia.[2]

সভাতে স্থির হয়েছিল শিক্ষালয়টির নাম হবে 'Hindoo College of Calcutta'।

কারা এই কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন? তঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি কি? সেই কলেজ স্থাপনের নেপথ্য ইতিহাস এবং কলেজ স্থাপনের পরবর্তী ঘটনা অনুধাবন করলে আমার দেখতে পাই বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রপহিক হিন্দু কলেজের মহান শিক্ষক ডিরোজিওর সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক সংঘাতের আগেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নেপথ্য লড়াই-এর ঘটনা ঘটে গিয়েছিল কলেজ স্থাপনকে কেন্দ্র করে। সেই লড়াই হয়েছিল রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ প্রথম লড়াইটা জিতেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় লড়াইয়ে তারা বাহ্যত জয়ী হলেও কার্যত এমন বেআব্রু হয়ে পড়েছিলেন যে সে জয়কে জয় না বলে পরাজয় বলাই ভালো ইতিহাসের পরিহাসই এমন যে সমকাল যাকে কঠিন দন্ডে দণ্ডিত করে ভবিষ্যৎ সেই ট্রাজিক হিরোকেই বরণ করে কালজয়ীর মর্যাদায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডিরোজিওর লড়াইতে সেই ঘটনাই ঘটেছিল। এই নিবন্ধের শেষে আমরা আসব সেই প্রসঙ্গে।

তিন থাকে আমরা সাজাব আমাদের বক্তব্য। প্রথম থাকে আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিটুকু। দ্বিতীয় থাকে আমরা তুলব সেই লড়াই-এর কথা যে লড়াই কলেজ স্থাপনের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। তার এক পক্ষে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্টাতৃবর্গ অন্যপক্ষে রামমোহন-দ্বারকানাথ। তৃতীয় পর্যায়ে আনব ডিরোজিওর কথা, যার সঙ্গে বেধে উঠেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের ধুন্ধুমার লড়াই। কলকাতার প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু সমাজপতিরা সেদিন কলেজ কর্তৃপক্ষের উর্দি গায়ে চড়িয়ে ডিরোজিওর মধ্যে বিদ্যুৎদীপ্ত বিদ্রোহের শক্তিকে নিকেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজেতিহাসের অগ্রগতির ধারা থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। কেননা সেই লড়াই-এর মধ্যে গর্ভিত ছিল মানব সভ্যতার চিরকালের দ্বন্দ্ব সূত্র:

The struggles are not merely the reformers and anti-reformers but between justice and injustice and between right and wrong.[৩]

হিন্দু কলেজ স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী কারা?

শোভাবাজারের রাজপরিবারের— গোপীকান্ত দেব, তদীয়পুত্র রাধাকান্ত দেব

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার — জয়কিষেণ সিংহ, রাজকিষেণ সিংহ, শ্রীকিষেণ সিংহ

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার— গোপীমোহন ঠাকুর, তদীয় পুত্র চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

নিমতালার বন্দোপাধ্যায় পরিবার - রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

জোড়াবাগানের দাস (সরকার) পরিবার - গঙ্গানরায়ণ দাস, শিবচন্দ্র সরকার

পাথুরিয়াঘাটার মুখার্জী পরিবার - বৈদ্যনাথ মুখার্জী, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী।

এবং

বর্ধমানের মহারাজা - রাজাধিরাজ তেজচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র

এছাড়া পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলেন - কলুটোলার সেন পরিবার-ভুক্ত রামকমল সেন ও রামবাগানের দত্ত পরিবারের রসময় দত্ত। এঁদের আর্থিক অবস্থা পূর্বোক্তদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার জোরেই এঁরা পরিচালন সমিতিতে গৃহীত হন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি পরিবারে অর্থ শক্তির মূল উৎস, সেই শক্তির পরিমাণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিশদ বিবরণ দেওয়া বাহুল্য। সামান্য দু-চার কথায় শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

রাধাকান্ত দেবের ঠাকুর্দা নবকান্ত (১৯৩৩-১৭৯৭) ছিলেন কোম্পানির তিনি তাঁর কর্মদক্ষতায় এতটাই লর্ড ক্লাইভের বিশ্বাসভাজন ছিলেন যে সিরাজদৌল্লা যখন কলকাতা আক্রমণ করতে এসে হালসি বাগানে ছাউনি ফেললেন তখন উপঢৌকন হাতে তাঁকেই পাঠানো হয়েছিল সিরাজ দৌল্লার সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির চিরস্থায়ী তালুকদারি দান করেন। তাঁরই উত্তরপুরুষ রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) বিদ্যায় এবং বিত্তে

সমুচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত হিন্দু গোষ্ঠীপতি চতুর্ধরীন মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করে হিন্দু সমাজে ত্রয়োদশ গোষ্ঠীপতির সম্মান অর্জন করেন। হিন্দু সমাজের যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনিই প্রথম মাল্য চন্দন ভূষিত হতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর পুনরুদ্ধার, লক্ষ্ণৌয়ের ত্রাণ, ইংলন্ডেশ্বরীর হাতে ভারতের শাসন ব্যবস্থা হস্তান্তর উপলক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে বল নাচ ও খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন তা ইংরেজদের শুধু বিমুগ্ধ নয়। বিস্মিত করেছিল।[৪] সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ শব্দকল্পদ্রুম রচনা ও সম্পাদনা। ফারসি জানতেন। ইংরেজিও বলতেন চমৎকার। ভাষাজ্ঞান যে উন্নতির সোপান তা তাঁদের চেয়ে বেশি কে জানত? তাঁর পূর্বপুরুষ নবকান্তের ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল মি. ড্রেকের কাছে ফারসিতে লেখা একটি পত্রের পাঠোদ্ধার ও উত্তর লিখে দিয়ে। ইংরেজ আমল—ইংরেজি শেখানোর বিদ্যালয় স্থাপনে গোপীকান্ত দেব ও রাধাকান্ত দেবের আগ্রহ একটু বেশি পরিমাণে থাকাই স্বাভাবিক।

জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ (১৭২২-১৭৭৮) মি. মিডলটন ও স্যার র‍্যামবোল্ডের অধীনে প্রথমে পাটনা, পরে মুর্শিদাবাদ জেলার দেওয়ানি করে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। তাঁর দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (১৭৬৪-১৮১২) ও জয়কৃষ্ণ (১৭৭০...)। দুই ভাই সাবালক হয়ে বাবার সম্পত্তি চারগুণ বাড়িয়ে ফেলেন।[৫] প্রথম জীবনে জয়কৃষ্ণ হল সাহেব ও কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়াম র‍্যামবোল্ড সাহেবের বেনিয়ান ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনে যে পাঁচজন সর্বাধিক টাকা দেন জয়কৃষ্ণ (জয়কিষেণ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মৃত্যুর পর বংশের একজন হিসাবে নবকৃষ্ণ ডিরেক্টর হন। তাঁরপর আসেন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপরাণ ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) এই পরিবারের সন্তান।

শ্যামবাজারের বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণরাম বসু (মৃত্যু -১৮২২) লবণের কারবার করে ফুলে ফেঁপে ওঠেন। সামান্য অর্থ নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। লবণের একটি পুরো সরকারী চালান কিনে গুদামজাত করে এক দফাতেই লাভ করেছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনের ২,০০০ টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়া দেওয়ানী লাভ করেন। কথিত আছে বাড়ির দুর্গোৎসবের পর বিসর্জনান্তে গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসার পথে যে কেউ পূর্ণকলস দেখাত তাকেই একটি করে টাকা দান করতেন। প্রায় ৭-৮ হাজার লোক পথে এজন্য সার বেঁধে বসে থাকত। কিশোর বয়সেই কৃষ্টরাম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানী হয়ে ওঠেন।[৬] 'দানবীর' ও বিদ্যোৎসাহী হিসাবে তাঁর সুখ্যাতির উত্তরাধিকার পুত্র গুরুপ্রসাদ বসুতে (মৃত্যু ১৮৫১) বর্তে ছিল। তাঁর বাড়িতে 'বেদাধ্যপনা নিমিত্ত এক সভাও' হয়েছিল। তিনি বিদ্যা বিষয়ে অর্থ দান করে (১৮২৫ সালে) গবর্নমেন্ট হৌসে 'ছয় পারচার খেলাৎ' পেয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৭]

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬০-১৮১৯) চন্দননগরে ফরাসি সরকারের অধীনে চাকরি করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভূত ধন সম্পদের মালিক হন। লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন 'এই প্রদেশে এমন জেলা কম আছে; যেখানে ঠাকুর পরিবারের কোন না কোন শরিকের জমিদারী না আছে।' গোমীমোহন অনেকগুলি ভাষা— সংস্কৃত ফরাসি, পর্তুগিজ, ফারসি, ইংরেজি উর্দ্দু জানতেন। তাঁর বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসত। একবার গোপীমোহনের বাড়িতে দুর্গোৎসবে যোগ দিতে এসে জেনারেল ওয়েলেসলি টানা পাখার দড়ি ছিঁড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পান। এককালীন ১০,০০০ টাকা দানের সূত্রে তাঁর পরিবারের একজন হেরিটেবল গভর্নর পদে নিযুক্ত হতেন হিন্দু কলেজে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ২য় পুত্র চন্দ্রকুমার ঠাকুর পরিচালন সমিতিতে আসেন। চন্দ্রকুমার ছিলেন ঠাকুর পরিবারের ৩০ তম অধস্তন পুরুষ। চন্দ্রকুমারের অন্য ভ্রাতা হরকুমার ও প্রসন্নকুমার কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন পরে।

হিন্দু কলেজের আর এক ডিরেক্টর নিমতলার রাধামাধব বন্দ্যোপাধায় (১৭৮৭-১৮৫২) পাটনার সরকারি আফিম কুঠির দেওয়ান হিসাবে নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন।[৮] বিত্তের সঙ্গে ইংরাজি ও ফার্সি ভাষায় দখল থাকায় ইউরোপীয় ও দেশীয় সমাজে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ছিল। রামদুলাল দে, গুরুপ্রসাদ বসু, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসা ছিল। জেনারেল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নানা লাভজনক কারবারে তাঁর শেয়ার ছিল ও টাকা খাটত।

জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গারায়ণ দাস 'ইন্ডিগো কিং' নামে বিখ্যাত ধনী পামার কোম্পানিতে ৪১ বছর চাকরি করেন। 'লালদিঘির মতো খাস সাহেব' পাড়াতে যে ক'জন সম্পন্ন বাঙালির স্থাবর সম্পত্তি ছিল গঙ্গানারায়ণ তাদের মধ্যে অন্যতম। ডালহৌসি স্কোয়ারে ডেকার্স সাহেব বসতবাটি সমেত ৪ বিঘে ১০ কাটা জমি বিক্রি করলে গঙ্গানারায়ণ তা কিনে নেন।[১০] অর্থদান সূত্রে তিনি হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র শিবচন্দ্র (দাস) সরকার কলেজ পরিচালন সমিতিতে আসেন। কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল। ১৮৩০ সালে 'ইংলন্ডের বাদসাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎসবে গভর্নমেন্ট হৌসে এই প্রথম এদেশীয় খানদানী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।[১১] এতে আমন্ত্রিত রাজা, দেওয়ান, বাবুদের সঙ্গে শিবচন্দ্র সরকার উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামের খ্যাতনামা পন্ডিত মনোহরচন্দ্র মুখার্জীর বংশধর দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জী 'আত্মীয় সভা'য় তাঁর যাতায়াত ছিল। ডেভিড হেয়ার আত্মীয় সভাতেই ইংরাজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বৈদ্যনাথ পরবর্তী পরিবর্তিত ক্রমে রামমোহন নিজেকে সরিয়ে নিলেও বৈদ্যনাথ মুখার্জী রয়ে যান সক্রিয় ভূমিকায়। কলেজ স্থাপিত হলে তিনি নেটিভ সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন ১০০ টাকা বেতনে। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকায় তাঁকে সদ্বংশজাত সুশীল, বিত্তবান, বিচক্ষণ ও পরোপকারী বলে উল্লেখ করা হয়।[১২] তিনিই রামকমল সেনকে হিন্দু কলেজের ম্যানেজার নিয়োগ করার সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী হন পরবর্তী নেটিভ সেক্রেটারি। হিন্দু সমাজের পথে নানা হিতৈষী উদ্যমে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতেন। চিফ জাস্টিফ অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র।

১০,০০০ টাকা চাঁদা দিলে হিন্দু কলেজ হেরিটেবল গর্ভনর হওয়া যেত। বর্তমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের (১৭৬৪-১৮৩২) নামটি হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ হেরিটেবল গর্ভনর হিসাবে পরিচালন সমিতির তালিকায় ললাট টিকার মতো ব্যবহার করতেন। পাঞ্জাবের ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত সঙ্গম রায় ছিলেন বর্ধমান মহারাজার আদিপুরুষ। ১ লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে ঔরঙ্গজেবের আমলে এঁদের পূর্বপুরুষ বর্ধমানের মহারাজা হন। ১৭৮৩ সালে ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৬ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল বর্ধমান রাজ্যে।[১৩] কলকাতায় এঁদের অধিষ্ঠান ছিল। ১০.০০০ টাকা চাঁদা ছিল তাদের কাছে নস্য।

এছাড়া কলুটোলার রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) ও রামবাগানের রসময় দত্ত (১৯৭৯-১৮৫৪) কলেজ পরিচালন সমিতিতে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলেন। অস্বচ্ছল পরিবার থেকে অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিদ্যাচর্চার জোরে রামকমল সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। স্বয়ং উইলসন ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর মৃত্যুতে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' লিখেছিল অনেক ব্যক্তি আছে যাঁরা অজ্ঞাত অবস্থা থেকে মহাধনী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাঁর মতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি।[১৪] রামকমল ছিলেন প্রবল ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৪৪) তাঁর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

রসময় দত্তের পিতা নীলমণি দত্ত বর্ধমানের গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। নীলমণির সখ্য ছিল স্বয়ং কেরীর সঙ্গে। নীলমণির জ্যেষ্ঠপুত্র রসময় দত্ত ইংরেজি বিদ্যায় পারগ ছিলেন।[১৫] তিনি মেসার্স ম্যাকিলপ কোম্পানির বেনিয়ান হয়েছিলেন। তিনি এক সময় স্মল কজেজ কোর্টের জজ নিযুক্ত হন। বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার গুণে দত্ত পরিবার কলকাতায় বিশিষ্ট পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। প্রসঙ্গত বলা যায় খ্যাতনামা মহিলা কবি তরু দত্ত (১৮৫৬ -১৮৭৭) রসময় দত্তের নাতনী ও মাইকেল সতীর্থ গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কন্যা। রামকমল সেন ও রসময় দত্ত পরবর্তীতে পরিচালন সমতিতে গৃহীত হলেনও কলেজ স্থাপনের উদ্যোক্তা ছিলেন তা নয়।

উপরোক্ত আলোচনা প্রয়োজনের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হলেও বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা নয় কারা ছিলেন প্রধান হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোক্তা এবং স্থাপন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালন সমিতির দেশীয় সদস্য। এঁদের শ্রেণী পরিচয় জলের মতো স্পষ্ট। মোটামুটিভাবে কলকাতার এই পরিবারগুলির বৃত্তের মধ্যেই হিন্দু কলেজের পরিচালন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। শিক্ষক বা অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্বের কোন অবকাশ ছিল না। এমনকি ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে এর বাইরে কারো প্রবেশাধিকার ঘটতে পারে না। হিন্দু কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা একটা বাণিজ্যিক কোম্পানির মতো। পুঁজি বিনিয়োগ কারীরাই যেমন এক একটি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হন ঠিক তেমনি হিন্দু কলেজ পরিচালন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কিছু পরিবার ও ব্যক্তি ছিলেন তার হর্তা-কর্তা বিধাতা। এঁদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় ছিল শিক্ষানুরাগী তকমা লাগানো প্রতিষ্ঠাকারী বিত্তবান হিন্দু সমাজপতিদের একটি গোষ্ঠী বিশেষ। হিন্দু কলেজ ছিল এঁদের এক রকম বিনিয়োগ কেন্দ্র। দেশের স্বার্থে আধুনিক শিক্ষার প্রথম অভ্যর্থনাকারী এরকম একটা অদৃশ্য পতাকা তাঁরা উড়িয়েছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যে হিন্দু সমাজের অতিরক্ষণশীল ধারারই প্রতিনিধি মাত্র তা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল ডিরোজিওরও সঙ্গে সংঘাতের সময়। সে প্রসঙ্গে যথা সময়ে আসা যাবে।

২

হুগলী জেলার রাধানগরের জাতক রামমোহন রায়। নানা দেশ ঘুরে ১৮১৪ সালে কলকাতায় যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন কলকাতার সামাজিক জীবনে একটা গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। কলকাতার পূর্বোক্ত সমাজপতিদের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানগরিমার বহর ও সমাজ হিতৈষণার দীপ্তি যত উল্লেখযোগ্যই হোক না কেন রামমোহনের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) যাদের ঠাকুর পরিবারের ছোট তরফ বলে চিহ্নিত করা হয় বিত্তার্জনের ব্যাপারে তাঁর নব নব বিস্তার ও উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে উদারতাপূর্ণ অভিজাত্য ও দানশীলতাও ছিল অতুলনীয়। বিত্ত ও বিদ্যার আন্ত সম্পর্ক যদি আধুনিকতার মূল চাবিকাঠি হয় তবে তাঁর ভারসম সংযুক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে যেভাবে ঘটেছিল তার কোনো তুলনা সমকালে কলকাতায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। বিদ্যা ও বিত্তের কর্ষণে রামমোহন ও দ্বারকানাথের যুগলবন্দীই ছিল উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাসের আধুনিকতাকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে অগ্রণী হবার যোগ্যতম দেশীয় ব্যক্তিত্ব। উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় ইতিহাসের সাধারণ পাঠক ও জানেন তাঁদের কৃতিত্ব শুধু দেশীয় সমাজ নয় আন্তর্জাতিক বিস্তারকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কৃতিত্ব এতটাই প্রমাণসিদ্ধ যে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৪৩ সালের ১ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৫/০৭-১৮৪৩) এই দু'জনের কথাই পেড়েছিলেন। লিখেছিলেন—

Rammohun Roy and Dwarakanath Tagore were it is True, received with high eclat and respect in England... The two gentlemen, I have named would reflect honour on any country.[16]

কলকাতায় পাশ্চাত্য বিদ্যার একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটি জিনিস লাগার কথা। ১. পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিকতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। ২. বিদ্যায়তন স্থাপনের জন্য অর্থ মানে চাঁদা। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অভ্যর্থনা জাননোর ব্যাপারে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা ১৮২৩ সালে ১১ই ডিসেম্বর লড আমহার্স্টকে লেখা ঐতিহাসিক চিঠিতে পরিষ্কার। ১৯১৩ সালের সনদ অনুসারে দেশীয়দের শিক্ষার্থে বরাদ্দ হওয়া টাকা কোন খাতে খরচ হবে অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েন্টালিস্ট আখ্যাত দু'দলসাহেব যখন কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না[১৭] এবং শেষ পর্যন্ত

ওরিয়েন্টালিস্টদের জোরালো সুপারিশে সংস্কৃত কলেজ ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে যাচ্ছিল তখন রামমোহন রায় আমহার্স্টকে চিঠি লিখে জানালেন—

‘যখন আমরা আশা করেছিলাম জ্ঞানের প্রভাতসূর্য দেখতে পাব... পশ্চিমের আলোকিত জাতি হিসাবে আপনারা এশিয়ায় আধুনিক ইউরোপীয় মানবিকী বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চার বৃক্ষরোপণ করবেন... তখন দেখলাম সরকার বাহাদুর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালনযোগ্য সংস্কৃত স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সংস্কৃতের চর্চা ভারতে বহু বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। ইউরোপে বেকনের পূর্বে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এ হচ্ছে সেই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র। এই শিক্ষা ব্যাকরণের কচকচি ও অবাস্তব দর্শনের খুঁটিনাটি দিয়ে তাদের মন বোঝাই করে দেবে। তা শিক্ষার্থীদের বা সমাজের কোনো কাজে আসবে না। শিক্ষার্থীরা শিখবে সেই বিদ্যা যা দু'হাজার বছর ধরে ভারতের সমস্ত প্রান্তে চালু রয়েছে, যা অর্থহীন ও অসাড়; যা প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ। ...দেশীয়দের উন্নতিই যদি সরকার বাহাদুরের লক্ষ্য হয় তবে উদার ও বুদ্ধি বিভাসিত শিক্ষা নীতির ধারণ স্বরূপ Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy with other useful Sciences শেখানোর ব্যাপারে মদত দিতে হবে। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মদত দিতে হবে যেখানে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বানরা বিদ্যাদান করবেন এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও সুসজ্জিত পরীক্ষাগার থাকবে।[১৮]

এবং এই চিঠিই প্রথম ভারতীয় কণ্ঠস্বর যা নির্ধারণ করে দেয় সরকারী শিক্ষানীতির গতিমুখ। বরাদ্দকৃত যে অর্থে সংস্কৃত কলেজের বিল্ডিং হতে যাচ্ছিল সেই বিল্ডিং এমনভাবে নির্মিত হল যাতে অর্থ সংকটে আসন্ন ভাড়াটে বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো পূর্ব স্থাপিত হিন্দু কলেজেরও মর্যাদাপূর্ণ অধিষ্ঠান হতে পারল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অর্ভর্থনা জানানোর জন্য এই সোচ্চার ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের কারোরই ছিল না। তাঁরা ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলেজ গড়তে অগ্রসর হয়েছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। ইংরাজি শিক্ষা ছিল তাঁদের কাছে কাজ হাসিলের উপায়মাত্র। উদার মানবতাবাদী শিক্ষাদর্শন থেকে তাঁরা ইংরাজি শিক্ষাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাননি যথাকালে তা সুপরিস্ফুট হয়।

এবার আসা যাক্ দেশহিতৈষী মনোভাব থেকে চাঁদাদানের প্রসঙ্গে। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তা বিত্তবানবর্গ Subscriber হয়েছিলেন বিনিময়ে তাঁরা কি পাবেন তা কড়াক্রান্তি হিসেবে বুঝে নিয়ে। বলা হয়েছিল ২১শে মে ১৮১৭ -র আগে যিনি কলেজ ফান্ডে সর্বোচ্চ অর্থ এককভাবে দান করবেন তিনি হবেন Chief founder, আর যাঁরা ৫০০০ বা তার বেশি টাকা দান করবেন তারা হবেন কলেজের Principal founder।

দেড় লাখ টাকা চাঁদা ওঠার আগে ৫০০০ টাকা দেবেন সেরকম প্রত্যেক একক দাতা ‘Heritable Governor’ -এর মর্যাদা পাবেন। তিনি বা তাঁর নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি member of the committee of Managers হতে পারবেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের একজন ঐ পদ অলঙ্কৃত করতে পারবেন। যাঁরা যৌথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ৫০০০ টাকা দেবেন তাঁরা নির্ধারিত নিয়ম মেনে একজনকে এক বছরের জন্য কলেজের Director নির্বাচিত করতে পারবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি[১৯]। সেইভাবেই গঠিত হয়েছিল কলেজের পরিচালন সমিতি। অর্থাৎ কলকাতার তথাকথিত বিদ্যোৎসাহী ধনীরা টাকা দিয়ে পরিচালন সমিতির নিজেদের আসন ক্রয় করেছিলেন। কলেজের পরিচালন সমিতি নামক চক্রব্যূহে নির্দিষ্ট কিছু পরিবার ও ব্যক্তির বাইরে বিশেষ কারো প্রবেশ করার উপায় তাঁরা রাখেন নি। কলেজের প্রথম পরিচালক সমিতি গঠিত হয় ২ জন হেরিটেবল গভর্নর ও ৫ জন ডিরেক্টরকে নিয়ে। মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর ও পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর হলেন হেরিটেবল গভর্নর আর ডিরেক্টর হয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণ দাস, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গোপীমোহন দেব ও হরিমোহন ঠাকুর। এই সব পদের অধিকার কত টাকা দিয়ে কেনা যেত তা আগেই বলা হয়েছে।

সমাজ হিতৈষণায়, শিক্ষাকল্পে ও সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা সৌজন্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদার দানশীলতা যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করত তার প্রমাণ সুপ্রচুর দ'একটা উদাহরণ দিই। হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যার্থ এবং উপকার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্তি অর্থাৎ একখানি ছবি কলেজ ঘরে স্থাপন করার জন্য চাঁদা তোলা সাব্যস্ত হলে যাঁরা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের চাঁদার পরিমাণ এইরকম—

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর	৩০০ টাকা
চন্দ্রকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর	২৫০ টাকা
রাথাকান্ত দেব	২০০ টাকা
রামকমল সেন	২০০ টাকা
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০ টাকা
রসময় দত্ত	৫০ টাকা
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫০ টাকা

ডিস্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটিতে হিন্দু কলেজের মানীয় হেরিটেবল গভর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর যখন ১০০ টাকা চাঁদা, দেশীয় সেক্রেটারি ৫০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন দ্বারকানাথ দিয়েছেন ৫০০ টাকা।[২১] ১৮৩৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদপত্রে এতদেশীয় এক মহাশয় ব্যক্তির অপূর্ব বদান্যতা শিরোনামে একটি সংবাদ বের হয়— ‘গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রী যুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সৌসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।[২২] মাত্র ৫০০০ টাকা বা ১০০০০ টাকা দান করে কলকাতার অন্য তরফের দানশীল বিত্তবানরা যখন হিন্দু কলেজের চিরস্থায়ী বা

বংশানুকমিক পদমর্যাদা ক্রয় করেছেন তাঁর পাশে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই নিঃস্বার্থ ও সৌজন্য সম্মত দানের পরিমাণটা খেয়াল করার মতো। রামমোহনের আধুনিক মানবতাবাদী শিক্ষাদর্শন এবং দ্বারকানাথের উদারতাপূর্ণ দানশীলতার ধারা আমদের সমাজেই বহমান ছিল কিন্তু রাধাকান্ত দেবরা গোষ্ঠীতন্ত্রকে পোষণ করতে গিয়ে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই সম্ভাবনাকে। আমাদের বক্তব্য বিদ্যাচর্চার সর্বাধুনিক বৈশ্বিকতাকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে রামমোহন রায় এবং বিত্তার্জন ও বিত্ত ব্যবহারে গতিশীল উদারতার দিক থেকে দ্বারকানাথ ছিলেন কলকাতার সর্বোচ্চ দেশীয় প্রতিনিধি। হিন্দু কলেজ স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাঁরা দু'দিক থেকেই তাঁরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ। অথচ এঁরা পালন করতে এসেছিলেন অগ্রণীর ভূমিকা। এইখানে একটা ঐতিহাসিক অনৌচিত্যতা তৈরি হয়েছিল। তা প্রকট ও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যিনি তাঁর নাম হেনরি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও।

কিভাবে রাধাকান্তদেবরা ঠেকিয়েছিলেন রামমোহনকে সেই কৌতূহলজনক প্রসঙ্গে আসব আমরা। তথ্য প্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সমাজ হিতৈষণার রামমোহন স্থাপিত আত্মীয় সভায় এক মিটিং-এ ডেভিড হেয়ার কথাটা উত্থাপন করেছিলেন যে দেশীয়দের উন্নতির জন্য ইংরাজি শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়া যায় কিনা।[২৩] বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই মর্মে চাঁদা তোলার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিতে বলা হয়। তিনি বিচারপতি হাইড ঈস্টের কাছে প্রস্তাবটি পৌঁছে দেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় অন্য মহলের বৈদ্যুতিক তৎপরতা। হাইড ঈস্ট একদিন অবাক হয়ে দেখলেন শহরের গণ্যমান্য একদল সমাজপতি ইংরাজি কলেজ স্থাপন করার আলোচনা করতে তার বাসগৃহে উপস্থিত (১৮১৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর)। হাইড এও দেখে বিস্মিত হলেন ইংরাজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সেই সভায় ৫ জন সংস্কৃত পন্ডিতও উপস্থিত।[২৪] কমিটিও আগেই গঠিত। চাঁদার কথা উঠল। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকেরা বলেই ফেললেন, রামমোহনের কাছে চাঁদা নেওয়া যাবে না। কেন? তিনি বিধর্মী সঙ্গ করেন, 'তাঁহার আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারা মত নহে।' হাইড ঈষ্ট চিঠিতে লিখেছেন, They particularly disliked his associating himself as much as he dose with musalmans.[২৫]।

উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না, যেহেতু তাবৎ মত নহে।[২৬] সংস্কৃত পন্ডিতরা কেন এসেছেন তার মর্মার্থ বোঝা গেল। শোভাবাজারের রাজসভায় সংস্কৃত পন্ডিতরা বহুদিন ধরে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকেন। রাধাকান্ত দেবের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় তাদের সামিল করা হয়েছিল রামমোহনকে হিন্দুরা পছন্দ করে না এটা ঈস্টকে কনভিন্স করানোর জন্য। সেই দলে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ছিলেন যাঁর সঙ্গে পরে রামমোহনের ধর্ম বিষয়ে বিতর্ক হবে।[২৭] বিচারপতি হাউড ঈস্টের বাসগৃহকে বোড়ের ঘর হিসাবে ব্যবহার করে হিন্দু সমাজপতিরা কিস্তি মাৎ করলেন।

ব্যাপার বুঝে রামমোহন হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ থেকে সরে থাকলেন। তাঁর অন্যতম সুহৃদ দ্বারকানাথকে ঠেকানোর জন্য তাঁরা ঠাকুর পরিবারের বড় তরফকে সামনে এনেছিলেন। ক্ষমতা জাহির করার এসব ছেঁদো গোষ্ঠাদ্বন্দ্বে মাথা ঘামানোর মনোবৃত্তি দ্বারকানাথের ছিল না। সুতরাং রামমোহনের মতো তিনিও রয়ে গেলেন বাইরে। আর এ খেলায় জিততে হিন্দু সমাজপতিরা খেলেছিলেন হিন্দুত্বের তাস। কলেজের নাম রেখেছিলেন হিন্দু কলেজ। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য খাড়া করেছিলেন 'The tuttion of the sons of respectable Hindoos'[২৮] সরকারের সঙ্গে যৌথ পরিচালনার প্রস্তাব পাঠানোর সময়ও তাঁরা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন নি। it will nerver be forgothen that is a hindo institution।[২৯] পরিচালন সমিতিতে ইউরোপীয় সদস্য এলে যদি কখনো ভোটদনের প্রয়াজন হয় বলা হয়েছিল, always giving preference to the votes of the Hindoo members respecting the Hindoo College. ।[৩০] কলেজের সংগঠকরা প্রথমাবধি হিন্দুত্ব-এর ভিত্তিটি সুদৃঢ় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দুত্বের পরিখা দিয়ে তাঁরা পাশচাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগটিকে প্রথমেই ঘিরে ফেলেছিলেন। উদ্যোক্তারা কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য খাড়া করেছিলেন National education for the Hindoo Childern। রামমোহন আমর্হাস্টকে যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন তাতে সামগ্রিকভাবে দেশের অন্ধকার দুরীভূত করার কথাই বলেছিলেন 'to improve the natives of India'।[৩১] হিন্দু —এই জতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেন নি। রাধাকান্তদেব দের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলে যে শিক্ষাদর্শন ছিল তা প্রয়োজনবাদী, জাতি ও শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকারী। রামমোহন দ্বারকানাথের পক্ষে সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভভও ছিল না। সুতরাং রক্তপাতহীন প্রথম যুদ্ধে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোক্তারা জিতেছিলেন।

৩

কিন্তু আট ঘাট বেঁধে যাঁরা কলকাতায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জয়পতাকা রামমোহন - দ্বারকানাথের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তাঁরা যে প্রকৃতপক্ষে মানবতাবাদী আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির শত্রু তা পদে পদে ফুটে উঠতে লাগল। সতীদাহ প্রথার রদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ধর্মসভা-র সভায় সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল হিন্দু কলেজের গণ্যমান্য আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তকদেরই।[৩২] সেই প্রসঙ্গের বিশদে যাব না। হিন্দু কলেজে স্থাপনের উদ্যোগযুদ্ধে তাঁরা জিতে ছিলেন কিন্তু আরো বড় হার তাঁদের বছরের এক শীর্ণ ইউরোপীয় তরুণকে যখন তাঁরা চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন তখন ভারতেও পারেন নি দক্ষিণ বাতাসকে ঠেকাতে গিয়ে ঝড়ের দরজা খুলে দিচ্ছেন তাঁরা। রামমোহনকে এড়াতে পেরেছিলেন কিন্তু এড়াতে পারলেন না ডিরোজিওকে। পরিচালন সমিতি চেয়েছিলেন ছেলেরা শিখবে ইংরেজি কিন্তু চলবে খাঁটি দেশি মতে। যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাবো না।

কিন্তু তা হবার নয়। হলও না। ডিরোজিও শিক্ষক হিসাবে কলেজে যোগদান করে রাধাকান্ত দেবদের শতরঞ্চে পরিপাঠি

করে সাজানো ঘুঁটি তছনছ করে দিলেন। যাদের জন্য পরিচালন সমিতির এই দুর্গ গঠন ও দখল সেই ছাত্ররাই কাঠের ঘুঁটি হয়ে থাকতে চাইল না। সব আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। ঘন্টার শব্দ ছিল। রুটিন ছিল সিলেবাস ছিল। কখন কলেজ শুরু হবে কখন শেষ হবে ঘন্টার শব্দ জানিয়ে দিত কোন্ ছেলে দেওয়াল বিভক্ত কোন্ শ্রেণি কক্ষে বসবে। কোন্ মাস্টার কোন্ সময় কি পড়াবেন? সবই ছিল সুনির্ধারিত, পূর্ব নির্দিষ্ট।[৩৩] কিন্তু শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিও প্রবেশ করতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। ছাত্ররা কলেজ শুরুর অনেক আগে আসে; ছুটি হয়ে যাবার পরও ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত Conversazione নামক আলোচনায় সভায় যোগদান করার জন্য থেকে যায়। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্ররা একই সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ায়। তারা নির্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে থাকে না। সিলেবাসে নেই এমন সব গ্রন্থেই তাদের আগ্রহ বেশি। বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ডিরোজিওর বাড়ি পর্যন্ত যায়। সন্ধেয় মিলিত হয় সভায়। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়িতে মঙ্গলবার সন্ধেয় এক সভা বসায়। 'পার্থিনন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে। আলেকজাণ্ডার ডাফের ধর্মপ্রচার সভায় দল বেঁধে গিয়ে বসে। সতীদাহের বিরুদ্ধে বলে। মুসলমানের দোকানে বিস্কুট খায়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যে আগ্রহ বেশি। কালীকে বলে গুড মর্নিং ম্যাডাম। গঙ্গাজলের পবিত্রতায় অবিশ্বাস করে। গীতার পরিবর্তে ইলিয়ড আওড়ায়। ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানে না। লোকাচার অগ্রাহ্য করে। পিতৃ পিতামহের ধর্মে আস্থা নেই, সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বলে সত্য কি? কোনো শাস্ত্রীয় আচার পালন করতে বললে বলেন এর পিছনে কিছু যুক্তি আছে? স্ত্রী শিক্ষা, পশুনিধন, দাসত্ব প্রথা, দেশীয় বিবাহ বিধি, ব্যক্তিগত সুখ, সামাজিক সমৃদ্ধি, ঔপনিবেশিকতা, বিচারালয়ে দুর্নীতি, রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র-প্রজাতন্ত্র, ডুয়েলিং, এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাস, পরাধীনতা-স্বাধীনতার অধিকার সবকিছু নিয়ে তর্কে মাতে।[৩৫] সংস্কারের পরিবর্তে জ্ঞানকে বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিকে ধর্মের পরিবর্তে মানবতাকে, ব্যক্তিগত সুখের পরিবর্তে সামাজিক হিতৈষণাকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা কথায় কথায় নিউটন, ডেভি, লক, হিউম, কান্ট, রিড, মিল, টম পেইন, ক্যাম্পবেল, টমাস মূর, বার্নস, সেক্সপীয়র, বায়রন আওড়ায়।[৩৬] এ সমস্ত কিছুর মূলে আছে ডিরেজিও। তিনি কলেজে এলেই ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরে। তাঁর কথাতেই তারা ওঠে বসে, দাঁড়ায়, চলে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া এক পা চলতে চায় না।[৩৭] তারই মদতে ছেলেরা সব বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তিনি ছেলেদের টেনে নিচ্ছেন সিলেবাস, রুটিন, ক্লাসরুমের বাইরে। তাঁর শিক্ষণ বৈগুণ্যে শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালগুলো সরে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল হীন ক্লাসরুম চলতে শুরু করেছে। রক্ষণশীল কলেজ কর্তৃপক্ষ বা সেকেল অভিভাবকদের ক্ষমতা কি তাদের থামায়।

লক্ষ লক্ষ লোক বলে, 'থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, একি পাগলামো।'
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে,
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেওয়ালে।

শুধু কলেজ নয়, সমস্ত শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের বেপরোয়া কাণ্ড কারখানা।

কলেজ কর্তৃপক্ষ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠতে লাগলেন। একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করতে থাকলেন তাঁরা। কলেজ ছুটির পর ডিরোজিওর পরিচালনায় কলেজে চলছিল আলোচনাসভা। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে নানা শ্রেণীর ছাত্ররা হমড়ি খেয়ে পড়ত। আলোচনার বিষয় পাঠ্যক্রম ছাড়িয়ে নানান বিতর্কিত প্রসঙ্গে চলে যেতে থাকলে কর্তৃপক্ষ বললেন, কলেজ প্রেমিসে এ ধরনের আলোচনা সভায় অনুমোদন করা যায় না। ছাত্র সমেত সেই আলোচনা সভা চলে গেল শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান বাড়িতে। নাম হল একাডেমিক এসোশিয়েশন। কাঁটা চামচের ঝনঝনানি, আর বাইজীর নুপুরের রিনরিন শব্দে যে বাগানবাড়ির মাতাল হয়ে থাকার কথা তা হয়ে উঠল ইয়ং বেঙ্গলদের তর্কযুদ্ধের এরিনা, তাদের মানসিক ব্যায়ামাগার। কে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ? একই সঙ্গে তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠাপক বিত্তবান সিংহ পরিবারের সন্তান, এবং ডিরোজিওর ছাত্র। বাঘের ঘরে গোসের বাসা। পুরাতন পন্থী পরিবারের ভোগবিলাসপূর্ণ সংস্কৃতির উপর এসে পড়ছে নতুন শিক্ষার আলো। সেই আলেচানা সভায় আসতে থাকলেন এডওয়ার্ড রায়ান, আলেকজাণ্ডার ডাফ, কলোনেল বীটসন, এবং ডিরোজিওর ছাত্র। তর্কের বিষয় বিস্তারিত হল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রসঙ্গে। হিন্দু ধর্মের নানা বিধি এসে গেল তাদের তর্কের কাঠগড়ায়। যারা সভায় আসতে পারে না তাদের কাছেও বক্তব্য পৌঁছানো দরকার। উপায়? উপায় পত্রিকা প্রকাশ ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় ছাত্ররা বের করে ফেলল 'পার্থিনন' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৩০, ১৫ ফেব্রুয়ারি)। ছাপা হল স্ত্রী শিক্ষা, ভারতে ইংরেজদের বসবাস, বিচার ব্যবস্থা অনুচিত ব্যয় নিয়ে সুতীক্ষ্ণ সব লেখা। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। পার্থিননের ২য় সংখ্যা পাঠকদের হাতে পৌঁছোনোর আগেই পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হল।[৩৯]

পিতৃপিতামহের ধর্মে ছাত্রদের আস্থা শিথিল হয়েছে বুঝে আলেকজাণ্ডার ডাফ (১৮০৫-১৮৭৮) হিন্দু কলেজের কান ঘেঁষে কলেজ স্কোয়ারে বসালেন খ্রীষ্টধর্মের মহিমা জ্ঞাপক প্রচার সভা। প্রত্যাশা মতোই ছাত্ররা শুনতে গেল পাদ্রি হিল প্রদত্ত সেই বক্তৃতা। সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই খড়ের গাদায় আগুন ধরে গেলে যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা দাঁড়ালো[৪৭]। বিচলিত অভিভাবকদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হিন্দুত্বের যে নৌকো তাঁর কলেজকে কেন্দ্র করে নতুন করে সাজাতে চেয়েছিলেন তার অবস্থা তো ডুবুডুবু। আর নয়। এক্ষুনি যার বাজানো ঘন্টির শব্দে যাত্রী সমেত কলেজের বজরা বার দরিয়ায় গিয়ে পড়েছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দরকার।

১৮৩১ সালের ২৩শে এপ্রিল। শনিবার। শুরু হল রামকমল সেনকে দিয়ে ডাকানো রিকুইজিশন মিটিং। এজেন্ডার লক্ষ্যবস্তু সুনির্দিষ্ট। ১৯ দফা প্রস্তাবের ১ম দফাতেই তা স্পষ্ট—

Mr.Derozio being the root of all evils and cause of public alarm should be discharged from the

college and all communication, between him and the pupile be cut off.[৪১]

বাকি ১৮ দফা প্রস্তাবের মধ্যেও ডিরোজিও ফোবিয়াগ্রস্ত কলেজ কর্তপক্ষের ছাত্র শিক্ষক সংক্রান্ত কঠোর আচরণ বিধি রচনার অব্যাহত প্রয়াস। একবার সাপে যখন কেটেছে তখন ছাত্র শিক্ষক সকলের হাতে পায়ে নিরন্তর তাগা বাঁধার কর্মসূচি। সেই মিটিং-এ ডিরোজিওকে প্রথম improper শিক্ষক এই অভিযোগে বরখাস্ত করার কথা পড়া হয়।[৪২] তাতে সকলের সায় না মেলায় অভিযোগটা ঘুরিয়ে আনা হয় এইভাবে তার পড়ানোয় হিন্দু আবেগ আহত হচ্ছে— The cause of hostility to Hindooism'।[৪৩] সেই হিন্দুত্বের জিগির যা রামমোহনকে ঠেকানোর জন্য তোলা হয়েছিল। ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার প্রশ্নেও ব্যবহার করা হল সেই আদিম পাশুপত চলবে না। The works directed against the character and principle of our countrymen will be also excluded,।[৪৪] ভোটের প্রশ্ন উঠলে always giving preference to the votes of the Hindoo member respectiong the Hindoo College.[৪৪] অতএব ডেভিড হেয়ার, উইলসন মতদানে বিরত থাকতে বাধ্য হলেন। কাজ হাসিল করে গেল। পরিচালন সমিতির সেই সভায় একজন শেষপর্যন্ত ডিরোজিওর সপক্ষে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। দেশীয় সদস্যরা প্রায় সকলেই যখন হিন্দুত্বের আবেগে আঘাতকারী শিক্ষককে ছাঁটাই করা necessary বলে মতদান করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন It was unnecessary।[৪৫] কেননা তিনি শুধু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাবস্ক্রাইবার পরিবারের সদস্য মাত্র নন, ডিরোজিওর শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গের আদর্শবাদী তরুণও। ন্যায়ের জন্য লড়াই করার দীক্ষায় দীক্ষিত তিনি। ডিরোজিওকে ছাঁটাই করা হবে জেনেই তিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য নবকৃষ্ণকে বিরত করে স্বয়ং হাজির হয়ে গিয়েছিলেন বাঘের খাঁচায়। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বরখাস্তের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি তাঁর গুরুকে কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা যে প্রাচীনপন্থী সমাজপতিদের ঘরে সিঁধ কাটতে শুরু করেছিল তা জানান দিয়েছিলেন তিনি—

ডিরোজিওকে ছাঁটাই করে কি থামানো গেল তাঁকে? ছাত্ররা কি সব শান্তশিষ্ট হয়ে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে মুখ লুকালো? সভাসমিতিতে তর্ক বিতর্ক কি থেমে গেল? পত্র-পত্রিকা ছাপা কি বন্ধ করল তারা? মোটেই তা নয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৩-১৮৮৫) তখন পটলডাঙায় ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। তাদের উদ্যোগে পটলডাঙ্গা স্কুলে ডিরোজিও মেটাফিজিক্স বা নীতিদর্শন নিয়ে ধারাবাহিক সান্ধ্য বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সেখানে অন্তত শ'দেড়েক শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন।[৪৬] নতুন নতুন সভা সমিতি স্থাপিত হতে থাকল। বের হতে লাগল নানা পত্র-পত্রিকা।[৪৭] ছাত্ররা তাদের সাধ্যমত চেষ্টায় ইংরাজি শেখানোর স্কুল স্থাপন করতে থাকলেন। ডিরোজিও সে সব স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে থাকলেন। কলেজে থাকা কালে পার্থেনন পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিলেন তাঁরা। ডিরোজিওর বরখাস্তের পর কোমর বেঁধে নামলেন সবাই। ১৯৩১ সালের ১৭ই মে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বের করলেন এনকোয়ারার পত্রিকা। ১৮৩১ সালের ১লা জুন ডিরোজিও স্বয়ং বের করলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান নামে একটি দৈনিক পত্রিকা। ১৮৩১ সালের ১৮ই জুন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ প্রকাশ করলেন জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা। এক মাসের মধ্যে তিন তিন খানা পত্রিকা। রক্ষণশীল কলকাতার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

১৮৩১ সালের ১২ই নভেম্বর বের হল পারসিকিউটেড নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। লিখেছেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে নায়ক বেনীলাল বলছে—

আমি কুসংস্কারের শিকার হয়ে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। যতদিন না এই কুসংস্কারের বেড়াজাল কাটতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই।[৪৮]

১৯৩৫ সালের ৬ই জুন। ক্যালকাটা লিটারারি গেজেটে বের হল একটি ছোট্ট নভেলেট। লিখেছেন পরিচালন সমিতির সদস্য রসময় দত্তের পুত্র এবং ডিরোজিওর ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত। তাতে বিদ্রোহী নায়ক ভুবনমোহন বলছে—

Let us unfurl the banner of freedom and plant it where Britinia now proudly stands'[৪৯]

১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী। চার্টার অ্যাক্ট (১৮৩৩) নিয়ে টাউন হলে সভা। রসিক কৃষ্ণ মল্লিক বলতে উঠলেন—

আমি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খ্রীষ্টীয় ধর্মস্থান বাড়ানোর যে প্রস্তাব এই চার্টারে রয়েছে সেই দিকে। I think a greater injustice could not have been commited (loud cheers) এ দেশে দরিদ্র জনগণ, নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয় তাদের কাছে আদায়ীকৃত টাকায় কোম্পানির সিভিল ও মিলিটারি সার্ভেন্টদের পারমার্থিক সুখের জন্য কেন এসব বাড়ানো হবে?[৫০]

১৯৩৮ সালে ১২ই মার্চ প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর পরিণততর উত্তরসূরি। ইয়ংবেঙ্গলদের দ্বারা চালিত এই সভায় মননশীল নানা নিবন্ধ পাঠ করা হত। ১৮৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত এই জ্ঞানোপার্জিকা সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সরকারী দুর্নীতি নিয়ে এমন আগ্নেয় বক্তৃতা দিলেন যে কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসন লাফিয়ে উঠে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের চার্জ আনবেন বলে হুমকি দিলেন।[৫১] অনুষ্ঠানের সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী রিচার্ডসনকে পাল্টা ধমক দিয়ে থামতে বাধ্য করলেন। ১৮৪২ সাল প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বেঙ্গল স্পেক্টেটর। বিধবা বিবাহের সপক্ষে লেখা হতে থাকল উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ রচনা।

১৮৪৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর টাউন হলে রামগোপাল ঘোষ এক বক্তৃতায় খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিস্টারকে ধরাশায়ী করে দিলেন। কট্টর এক ইংরেজি পত্রিকা লিখল—

A Demsosthenes has appeared on the Indian platform.[৫৩]

১৮৫৬ সালের ১লা জুন। ডেভিড হেয়ারের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪) একটি লিখিত ডিসকোর্স পাঠ করলেন— Young Bengal Vindicated. আবেগ কম্পিত ভাষায় তিনি বললেন—

ভারতবর্ষে আর কোনও শ্রেণি অহেতুক এতটা আক্রমণের শিকার হয়নি যতটা হয়েছে educated and liberal minded portion of the native community called Young Bengal....

বলো ভারতবর্ষে প্রথম কারা জ্ঞানের প্রতি অগ্নিবুভুক্ষু পতঙ্গের মতো ধাবিত হয়েছে? Lndeed, This Young Bengal! This Young Bengal.[৫৪]

১৮৫৬ সাল ৭ই ডিসেম্বর। প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন—

অদ্যকার দিন আমার দেশে ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্যরাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। নব্যবঙ্গের দল তো ছিলই...[৫৫]

লেখা হয়েছে—

সেদিন বিয়ের আসরে থিক-থিক করছিলেন ডিরোজিয়ারা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোথায় ছিলেন না তাঁরা? বর এসেছিল ইয়ং বেঙ্গলের বাড়ি থেকে ইয়ং বেঙ্গলের জুড়ি গাড়িতে চেপে, সেই ঐতিহাসিক বরানুগমনে তাঁরা ছিলেন সামনে পিছনে, দুপাশে। তাঁরা ছিলেন কন্যা সম্প্রদানের আসরে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই একাসনে।[৫৬]

দেখতে দেখতে এসে পড়লেন বাংলার নবযুগের কবি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কৃতি থেকে তীব্র জ্ঞানপিপাসা, বাক্-সংস্কৃতির পৌরুষ পূর্ণ প্রত্যাগতা, তারুণ্যঋদ্ধকৃত মানবতাবাদী জীবনদর্শন নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে পরিবর্বনকে নিয়ে এলেন ঝড়ের পিঠে।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে জিরোজিওর আত্মা অন্তঃশীল ধারার মতো প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় পুরাতনী ধারার ধারক-বাহকরা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আধুনিকতার উর্দি কিছুদিনের জন্য গায়ে চাপিয়েছিলেন। ডিরোজিওর ঝড় এসে তাঁদের বেআব্রু করে দিয়ে গেছে। সেদিনের সেই পরিচালন সমিতির দোর্দন্ডপ্রতাপ মাননীয় সদস্যরা কলেজ থেকে ছাঁটাই করে ডিরোজিওকে থামাতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিপ্লবের অমর শক্তি, মানব মুক্তির জয়গানকে কখনো থামানো যায় না। তাই শতবর্ষ পরেও ডিরোজিও সূচিত জীবনবাদের ধারা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মতো বিশ্ববরেণ্য আস্তিক কবির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।[৫৭]

উৎস সূত্র ও ধরতাই টীকা

১. ১৮৩৬ সালে এডাম সাহেব দেশীয় পঠন পাঠন সম্পর্কে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাতে দেখা যায় বাংলাদেশের ৫টি জেলায় ফারসি জানা হিন্দু শিক্ষার্থী সংখ্যা, ২০৯৬ জন আর মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ৫৫৮ (Adam's Report)

২. rules of the Institution, approved by the subscribers, August, 27, 1816. -The Calcutta Annual Directory and Register for the year, 1818.

৩. M. Carpenter, The last Days in England of the Raja Ram mohun Roy, 1866, 1976 edition, edited by S. Majumdar, p. 79, A letter written by Rammohoun Roy on Reform sill dated april 27, 1832.

৪. কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত, লোকনাথ ঘোষ লিখিত The Native Aristocracy & Gentry (১৮৮১) গ্রন্থের শুদ্ধোধন সেন কৃত বঙ্গানুবাদ, অয়ন সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৮২।

৫. সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা তরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৮, পৃ. ১৫১।

৬. দ্রষ্টব্য ৪নং টীকা, পৃ. ৩৯।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, সমাজ, ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫, সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ পৌষ ১৪০৮, পৃ. ২৪২।

৮. দ্রষ্ট্য ৪নং টীকা, ঠাকুর পরিবার, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৯. তবে, জোড়াবাগানের দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ, পৃ. ৫৫।

১০. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, ১ম পর্ব, তৃতীয় সংস্কণ, জুন ১৯৮৮, সুবর্ণ রেখা, পথ পরিক্রমা একটি অঞ্চল, পৃ. ১০৮।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২৫২

১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২৩২

১৩. রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমন রাজবংশানুচরিত ও জাল প্রতাপচাঁদ মামলা, সম্পাদনা গোপীকান্ত কোঙার, দেবেশ ঠাকুর, ২০০৩।

১৪. লোকনাথ ঘোষ; তদেব, পৃ. ১১৮

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ২য় খণ্ড, ১৮৩০-১৮৪০, পঞ্চম মুদ্রণ পৌষ, ১৪০১, পৃ. ৬৭৬

১৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলকাতার আদি আচার্য : ডেভিড ড্রামন্ড, Teacher of Derozio, ২০০৩, পুনশ্চ, পৃ. ২৯৫।

১৭. Amalesh Tripathe, Vidyasagar : The Traditional Morderiser 1974, pp. 8-9

১৮. J.K. Majumdar, Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in India, rpt. 1988, Letter No. 142, pp 205-252.

১৯. ২নং উল্লেখ

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব ১ম খণ্ড, ১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬, পৃ ২৫০

২১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২০

২৩. Pearychand Mitra, A Biographical Sketch of David Hare, Jijasa Edition, March 1979, Ed. y G.G. Sengupta, P.5. Hare submitted that the establisment of an English school would materially serve their cause.

২৪. সেখানে উপস্থিত ২০ জন দেশীয় ভদ্রলোকের মধ্যে ৫ জন সংস্কৃত পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, তারাপ্রসন্ন ন্যায়ভূষণ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রঘুমণি বিদ্যাভূষণ। বাকিরা হলেন—শিবচন্দ্র মুখার্জী, রামরতন মল্লিক, হরিমোহন ঠাকুর গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ মুখার্জী, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, গোপীমোহন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, কালীশঙ্কর ঘোষাল।

২৫. A.F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835, Calcutta-1976 Apendix p. 208

২৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ২য় খণ্ড, সং, ১৩৫৬ সাল, পৃ. ৪৮১ সমাচার দর্পণ, ১৫ই অক্টোবর, ১৮৩১।

২৭. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী শূদ্র ও স্ত্রীলোক দিগের বেদ্যধ্যয়নে অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার উত্তরে রামমোহন রায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) নামে একটি পুস্তিকা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্বিধ ভাষায় মুদ্রিত করে জবাব দেন।

২৮. ২নং উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

২৯. G.C.P.I. Unpublished Records vol. 8, p. 96, p. 98
সুরেশচন্দ্র মৈত্র, অশান্তকাল : জিজ্ঞাসু যুবক, পুঁথিপত্র, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৫৩

৩০. তদেব, সু. মৈত্র, প. ৫২

৩১. ১৮নং উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

৩২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১
সতীদাহ রসদ বিষয়ে সরকারের কাছে আপত্তি জানিয়ে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তা নিয়ে ধর্মসভার আলোচনা বসেছিল সংস্কৃত কলেজে ৫ মাঘ ১৭ জানুয়ারি রবিবার। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, রামকমল সেন, গুরুপ্রসাদ বসু, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

৩৩. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, ডিরোজিও : রুটিন ভাঙা এক মাস্টার, কোরক : প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১২

৩৪. T. Edwards, Henry Derozio, The Eurasian Poet Teacher and Journalist, 1884, Riddhi edition, 1980. pp. 66-67.
The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozi... The meetings were held almost daily after or before school hours.

৩৫. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, বাক সংস্কৃতি নির্মাণে ডিরোজিওর অবদান, চতুরঙ্গ বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৪।

৩৬. A. Duff, India and India Mission, Edinburg, 1839. Delhi Edition, 1988, pp. 638-639.

৩৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, ১৯৫৭ সং: পৃ। চুম্বক যেন লৌহকে আকৃষ্ট করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালক দিগকে আকৃষ্ট করিলেন, তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিকে ঘিরিত;
T. Edwards, Ibid, pp. 66-67
— হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

মি. ডিরোজিও ছাত্রদের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি জীবনে এক পাও চলতে চাই না। —অনুবাদ শ.সা.সু)।

একটি পত্রিকা লিখেছিল (উদ্ধৃত ডাফ)

অজ্ঞতা ও উষতার অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, বিশাল আকাশে এক ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েচে, সে ঝড় জ্ঞানের ঝড়, এই ঝড় ছিন্নভিন্ন করে অপসারিত করে দেবে সেই সব বাধাগুলিকে যা বহুদিন ধরে চিন্তার প্রবাহরুদ্ধ করে রেখেছিল। (অনুবাদ শ.সা.সু)।

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'একদিন রাতে', সহজপাঠ-২, কৈশোরক রচনা সঙ্কলন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পল. ৬-৭

৩৯. বিনয় ঘোষ (সম্পা) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ''বেঙ্গল স্টেক্টের'', প্যাপিরাস, ১৯৬৪, ধর্ম্মসভার গতবৈঠক, ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২। ৭ সংখ্যা, পৃ. ৩২-৩৭।

৪০. A Dulf, Ibid, P. 634

ডাফ লিখেছেন,

'দাবানলের মতো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল হিন্দু পাড়ায়। সেকেলে ধারণার শুষ্ক খড়ের গাদায় যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। .. (অনুবাদ আমার)

৪১. Song of the stormy Pelrel, edited by A.M., A.D., A.K., S.S.m. Derorio Commemoration Committee, Fel, 2001 Removal of Derovio, pp. 328-332.

৪২. Ibid

৪৩. Ibid

৪৪. দ্রষ্টব্য ২৯, ৩০

৪৫. Song the stormy Pelrel, Ibid.

৪৬. "India Gazetle', rpt. "Johu Bull", উদ্ধৃত সুরেশচন্দ্র মৈত্র, তদেব, পৃ। ৬৯-৭০।

৪৭. A Dulf, Ibid, p. 638

'There Were two practical ways in which this this spirit coutlineed publicly to manitest istelf. The first appeared in the almost instantanceous formation of a great number of delating societies. The Second way in which the newly awalaned spirit strongly manitest itself, was through medium of the press.

৪৮. The Perecuted or Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindu Society by Babu Krishna Mohan Benerjee, Calcutta, East India Press. No. 13. LollBazar, 1821.

৪৯. 'Culcutta Literary Gazette', 6 June 1835, A Journal of Forty eight hours in the year 1945, Kylash Chander Dutt.

৫০. G. Chattapadhyay (ed) Bengal Early Nineteebth Century (Selected ocuments), Town Hill Meeting on January 5, 1835, K.P. Bagchi. 1978.

৫১. Bengal Hurkaru' 2nd & 3rd March, 1843

৫২. বারিদবরণ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ জীবন ও সাধন, প্রজ্ঞা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৫, পৃ. ৪৩-৪৪।

৫৩. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাঙলা, আনন্দধারা ১৩৯২, পৃ. ৪৬-৪৭

৫৪. Young Bengal Vindicated, A Discourse read at the Hear Anniversary Meeting held on June 1st 1858 by Kristo Doss Paul, Nineteenth Century Studies, No. 4 ed. Alok Roy, 1973.

৫৫. মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, ১৯২৬, পৃ. ২৬৫।

উদ্ধৃত ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, (১৯৬৯), দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ২৯৭।

৫৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, বিধবা বিবাহ : বিদ্যাসাগর এবং ইয়ংবেঙ্গল 'মুর্শিদাবাদ বার্তা', বিশেষ সংখ্যা, সিপাহী বিদ্রোহ ও বিধবা বিবাহের দেড়শ বছর, ২০০৭।

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্মমোহ, পরিশেষ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ১৯৮২, পৃ. ৯৭৮।